Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

An in depth study of a song of Tagore : likhan tomar dhulay hayeche dhuli

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি : অন্তরঙ্গ পাঠ

Goutam Kumar Nag
Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract
The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : *likhon tomar dhulay hoyeche dhuli.* It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded. The song pivots on the theme of love and time. Our objective is to demonstrate through an in depth analysis of the salient linguistic features of the song, how the theme has been developed at various levels of the text : lexical, morpho-syntactic, phonetic and semantic.

Key words : Tagore's song, love, time, linguistic features

Article

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের একটি পরিচিত গানের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি (প্রেম /২৭৯)। অতি সামান্য ঘটনা থেকে অসামান্য শিল্পকীর্তি নির্মাণের বহু দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে দেখি ; আলোচ্য গানটি তার মধ্যে অন্যতম। এই গানের সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, এর কাব্যরূপটিই আমাদের আলোচ্য। আমরা দেখব এই গানরচনার পটভূমি গানের ভাববস্তুতে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে।সেইসঙ্গে কাব্যরূপের সৌন্দর্যরস আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর কাব্য-অবয়বের বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব --- শব্দচয়ন, ধ্বনিগত গঠন, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদান।

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা---
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল ভুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।[১]

প্রথমে গান সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যগুলি দেখে নেওয়া যাক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে গানের রচনাকাল ১৩৩২ সালের ১২ থেকে ১৬ চৈত্রের মধ্যে।[২] সুনির্দিষ্ট তারিখ কেন নেই তার কারণ প্রশান্তকুমার পালের রচনা থেকে অনুমান করা যায়। প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ডায়রীর এই অংশে প্রচুর কাটাকুটি রয়েছে, কখনও কখনও পাতা ছেঁড়া। ১৬ই চৈত্রের পর থেকে রচিত গানগুলির তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।[৩] তবে আমাদের আলোচ্য গানটি চৈত্রমাসে রচিত হয়েছিল এই বিষয়ে দ্বিমত নেই।

প্রশান্তকুমার পাল গানটি রচনার পটভূমি নির্মলকুমারী মহলানবিশের জবানিতে তুলে ধরেছেন :

> যখন "লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি" গানটা কবির মুখে প্রথম শুনলাম, শেখাতে গিয়ে বল্লেন, "জানো এ গানটা লেখা হোলো কেমন করে ? চাতালে বসে দেখলুম গ্রীষ্মের শুকনো হাওয়ায় লাল কাঁকরের রাস্তার উপর ফরফর করে একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো উড়ে চলেছে ; ব্যাস ঐ টুকু। কেমন যেন মনের মধ্যে একটি ছবি তৈরী হয় উঠলো যে একদিন যে চিঠির কতো আদর ছিল আজ তা অনাদরে পথের ধূলোর উপর উড়ে চলে যাচ্ছে। এই ছবিটাতে মন উদাস হোলো বলেই সঙ্গে সঙ্গে গান আপনি তৈরী হয়ে উঠেছে। [৪]

যে পরিস্থিতিতে গানটি রচিত হয়েছিল তার স্থানগত ও কালগত বাস্তবতা গানের কথাবস্তুতে কতখানি উপস্থাপিত হয়েছে সেটা দেখা নেওয়া যাক। অন্তরা অংশের পরপর দুটি কলিতে অর্থাৎ গানের তৃতীয় ও চতুর্থ কলিতে নির্দেশ করা হয়েছে যথাক্রমে কালগত ও স্থানগত পটভূমি : চৈত্ররজনী ও বন। বনের দৃশ্যকল্পটি পরবর্তী অংশে আরও বিস্তার লাভ করেছে। বাস্তব কালগত পটভূমির ঈষৎ রূপান্তর দেখা যায় গানের কথাবস্তুতে। চৈত্রমাসে রচিত গানটিতে মাসের নামটি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত কিন্তু গানটি রজনীতে রচিত হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। নির্মলকুমারী মহলানবিশ প্রদত্ত পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে এই ধারণাই হয় যে গানটি রচিত হয়েছিল দিবাভাগে, কোন এক তপ্ত দিনে। গানের জন্মকথায় যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার উল্লেখ রয়েছে তার সামান্যতম প্রতিফলন গানে দেখা যায় না। বরং আমরা দেখি মধুরজনীর স্নিগ্ধ মনোরম আবহ --- যা সম্পূর্ণভাবে কবিকল্পনার নির্মাণ। আর স্থানগত পটভূমির ক্ষেত্রে দেখি আংশিক নয়, পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। পূর্বোক্ত বিবরণ অনুসারে কবি বসেছিলেন "চাতালে", "লাল কাঁকরের পথের ধারে''। গানেও কবিকে উপবিষ্ট দেখি কিন্তু বনে বা হয়তো বনের ধারে --- যে বন বসন্তসমাগমে নবকিশলয়পুঞ্জে, মল্লিকামাধবীর সমাহারে সুশোভিত হয়ে ওঠে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় না গানরচনার মুহূর্তে চারিদিকে বসন্তের সৌন্দর্য বিরাজ করছিল, পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে কোথাও পুষ্পশোভার লেশমাত্র ছিল।

গানের সঙ্গে বাস্তব পটভূমির প্রধান যোগসূত্র "ফরফর করে উড়ে চলা একটা চিঠির টুকরো"। সেই "ছেঁড়া চিঠি" গানে উপস্থাপিত হয়েছে এক মহিমান্বিত রূপে । গানের শুরুতে "লিখন" এবং শেষে "আখরগুলি" --- দুটি শব্দই পত্রের অনুষঙ্গযুক্ত। তেমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উপস্থিতি গানের অধিকাংশ কলিতে। চিত্রাকারে বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে ।

কলিসংখ্যা	পত্রের অনুষঙ্গবাহী পদ / পদগুচ্ছ
১	লিখন
২	আখরগুলি
৩	---
৪	লেখনীলীলার রেখা
৫	আখরগুলি
৬	---
৭	নাম
৮	বাণী
৯	লিপি
১০	আখরগুলি

চিত্র ১

দেখা যাচ্ছে দশকলিবিশিষ্ট এই গানটির মধ্যে আটটি কলিতে পত্রের অনুষঙ্গবাহী পদ বা পদগুচ্ছের প্রয়োগ ঘটেছে। ব্যতিক্রম শুধু তৃতীয় ও ষষ্ঠ কলি। এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে বিশেষ্যপদ "আখরগুলি"র ও

বিশেষণ "পুরানো"র ; এদের প্রয়োগসংখ্যা যথাক্রমে তিন ও দুই । এই পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

এরপর এই বিশেষ্যপদ বা পদগুচ্ছগুলির সঙ্গে গানের ক্রিয়াপদসমূহের সম্বন্ধ পর্যালোচনাযোগ্য। চিত্রাকারে এইভাবে এই সম্বন্ধটি উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পৃক্ত পত্রের অনুষঙ্গবাহী বিশেষ্যপদ / পদগুচ্ছ	বিশেষ্যপদ/ পদগুচ্ছের সঙ্গে ক্রিয়াপদের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ
হয়েছে	লিখন (তোমার)	কর্তা
হারিয়ে গিয়েছে	আখরগুলি (তোমার)	কর্তা
বসে আছি	---	---
দিল দেখা	লেখনীলীলার রেখা (তব)	কর্তা
এল	আখরগুলি (তোমার পুরানো)	কর্তা
দিল আনি	ব্যথাভরা লিপিখানি (বিরহের কোন্)	কর্ম
দুলি দুলি	আখরগুলি (তোমার পুরানো)	কর্তা

চিত্র ২

দেখা যাচ্ছে একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব ক্রিয়াপদই পত্রের অনুষঙ্গবাহী কোন বিশেষ্যপদ বা পদগুচ্ছের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শেষোক্ত পদগুলি ক্রিয়ার কর্তা, একটি ক্ষেত্রে কর্ম। ব্যতিক্রমী ক্রিয়াপদটি হল অন্তরার শুরুতে "বসে আছি"। এই গানে পত্রের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র নেই ; এর কর্তা হল অনুক্ত "আমি" অর্থাৎ কবি স্বয়ং। এই ক্রিয়াপদের তাৎপর্য নিয়ে পরে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব।

গানের আস্থায়ীতে আমরা ইন্দ্রিয়চেতনায় উন্মোচিত ওই পত্রের রূপটি প্রত্যক্ষ করি। ধূলিমলিন সেই ছিন্নপত্রটি সম্পূর্ণ অপাঠ্য। সেই রূপদর্শনে কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত অনুভূতি গভীর শূন্যতার, অবরুদ্ধ হাহাকারের। "ধূলায় হয়েছে ধূলি" ---- প্রথম কলিতে লিখনের বর্ণনায় "ধূলা" শব্দের এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে নীরব বেদনার আভাস আছে, পরবর্তী কলিতে "হারিয়ে গিয়েছে" ক্রিয়াপদের প্রয়োগে তা বহুগুণ তীব্র হয়ে ওঠে।

তারপর কবির মরমী দৃষ্টিপাতে এক ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর ঘটে যায়। ধূলিধূসরিত সেই লিখন মুগ্ধচেতনায় ধরা দেয় নবতর রূপে। ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে বিবর্ণ, অপাঠ্য সেই "আখরগুলি" ছিন্নপত্রের অতিক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় নিসর্গ জগৎ জুড়ে। তারা দেখা দেয় বনে বনান্তরে, নব কিশলয়ের নয়ানাভিরাম শোভায়, মল্লিকার সুবাসে, মন্দ পবনে আন্দোলিত মাধবীশাখার শিহরণে। শুধু ইন্দ্রিয়চেতনায় বিধৃত বহির্জগতে নয়, তাদের বিস্তার অন্তর্লোকেও ; অকথিত সেই বাণী ধ্বনিত হয় "মনে"। একই অশ্রুত সঙ্গীত বেজে ওঠে ---বনমাঝে ---মনোমাঝে। গানের শুরু হয় সব হারানোর বেদনা নিয়ে ; কিন্তু আস্থায়ীর পর গানের বাকি তিন অংশে জুড়ে থাকে পুনরুজ্জীবনের, পুনরাবির্ভাবের বার্তা। রবীন্দ্রচেতনাবিশ্বে কখনও কোন কিছু হারায় না :

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।[৫]

আস্থায়ী ও পরবর্তী তিন অংশের আয়তনের একটা তুলনামূলক আলোচনা এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। আস্থায়ী দুটি কলিতে গঠিত, এবং প্রত্যেকটি কলি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু কলির সংখ্যার বিচারে অন্তরা ও আভোগ দুটি অংশই দীর্ঘতর ; দুটি অংশই তিনটি কলিতে গঠিত। সঞ্চারীর কলির সংখ্যা দুই হলেও এখানে আমরা দেখি দুই কলিতে বিস্তৃত একটি দীর্ঘ বাক্য। সামগ্রিকভাবে আস্থায়ীর সঙ্গে গঠনের তুলনা করলে

বাকি তিন অংশে একটা বিস্তারের চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথম দর্শনে যা শুধুই এক ছিন্নপত্র , তার বাণী ছড়িয়ে গেল দিকে দিগন্তে ---- আস্থায়ীর পরবর্তী অংশগুলির গঠনগত দৈর্ঘ্যের মধ্যে যেন সেই বিস্তারেরই ইঙ্গিত নিহিত।

এই গানের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল শব্দের পুনরাবৃত্তি। আস্থায়ীর পর প্রতি অংশেই দেখা যায় যুগ্মশব্দের প্রয়োগ --- বনে বনে, কাননে কাননে, দুলি দুলি। স্থানবাচক "বনে বনে" "কাননে কাননে" স্পষ্টতই স্থানগত ব্যাপ্তির ব্যঞ্জনাবাহী। বাক্য ও কলির দৈর্ঘ্য যে পরিধিগত বিস্তারের অনুভূতির সঞ্চার করে, এমন যুগ্মশব্দের প্রয়োগে তা গভীরতর হয়ে ওঠে। "দুলি দুলি" ক্রিয়াপদটি সেই ব্যাপ্তির মধ্যে গতিময়তার সঞ্চার করে।

শব্দের পুনরাবৃত্তির আর একটি রূপ আমরা দেখি গানের শুরুতে, প্রথম কলিতে (ধূলায় হয়েছে ধূলি) এবং পঞ্চম কলিতে অর্থাৎ গানের কেন্দ্রস্থলে (ভুলে এল ভুলি) । প্রথম ক্ষেত্রে "ধূলি" শব্দের পুনরাবৃত্তি হলেও ব্যাকরণগত রূপে পার্থক্য আছে --- বিভক্তিযুক্ত রূপ (ধূলায়) এবং বিভক্তিহীন রূপ (ধূলা)। পরবর্তী ক্ষেত্রে পঞ্চম কলিতে সমাধতুজ বিশেষ্য ও অসমাপিকা ক্রিয়া "ভুলে" এবং "ভুলি"র সহাবস্থান । আর্থস্তরে এই দুটি পদগুচ্ছ সম্পূর্ণ বিপরীত তাৎপর্যবাহী --- প্রথমটি বিলুপ্তির বার্তা বহন করছে, দ্বিতীয়টি পুনরাগমনের। কিন্তু ধ্বনিগত গঠনের স্তরে উভয়ের মধ্যে একটা সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় : উভয়ক্ষেত্রেই 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য। তরলস্বরের এই অনুপ্রাসের মধ্য দিয়ে যেন জলকলরোলের ধ্বনি বেজে ওঠে। এ যেন প্রবহমান কালস্রোত ---- এই স্রোতে যা একদিন ভেসে চলে গিয়েছিল ইন্দ্রিয়চেতনার সীমানা অতিক্রম করে, আজ তাই আবার উজানস্রোতে ভেসে এসে ধরা দিল সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর রূপে মুগ্ধ ভালোবাসায়, মগ্নচেতনার গভীরে। যা হরণ করে কাল, তার আর প্রত্যাবর্তন ঘটে না --- বিশ্বসংসারের এই অমোঘ বিধান যেন এক মুহূর্তের জন্য মিথ্যা হয়ে যায়। যে ভুল নিয়ে প্রশ্ন সেই ভুল বিশ্ববিধাতার --- চৈত্ররজনীর মাদকতায় বিশ্ববিধাতারও ভ্রান্তি ঘটে যায় । সেই মধুর বিস্মরণেই চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আখরগুলি আবার দেখা দেয় বনে বনে ।

পুনরাবৃত্তির আর একটি রূপ আমরা দেখি সমস্ত গানটি জুড়ে। বিভিন্ন কলিতে একই শব্দের পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ দেখা যায়। এই গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ হল সর্বনাম "তোমার" । এর প্রয়োগ মোর ছয়বার, সেইসঙ্গে আর একবার সমার্থক ''তব"। তিনটি কলিতে ব্যবহৃত হয়েছে "আখরগুলি" এবং "আজ" (দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যরূপ "আজি")। পুনরাবৃত্ত বিশেষণ গুণবাচক "পুরানো" এবং প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়বোধক "কোন্"।

সর্বনামের পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা অন্যসব পদের পুনরাবৃত্তির আলোচনা করব। আমরা দেখলাম সর্বনাম বাদ দিলে এই গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ বিশেষ্য "আখরগুলি" এবং কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ "আজ"। বর্তমান বাস্তবতানির্দেশক "আজ" এবং এই গানে অতীতস্মৃতিবাহী "আখরগুলি" শব্দযুগলের সমসংখ্যক প্রয়োগ যেন বর্তমান ও অতীতকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। চিরতরে হারিয়ে যাওয়া সেই মুহূর্তগুলি বর্তমানের মতই সত্য হয়ে ওঠে।

"আখরগুলি" শব্দটি প্রথমে এসেছে আস্থায়ীর শেষে তারপর পঞ্চম কলির শেষে অর্থাৎ গানের কেন্দ্রস্থলে, অবশেষে শেষ কলির শেষে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ্যটি সম্বন্ধপদ "তোমার"এর সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে বিবর্ণ, অপাঠ্য সেই আখরগুলির বর্ণনা দিতে কোন বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে অবলুপ্ত সেই আখরগুলি যখন অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন যুক্ত হল বিশেষণ "পুরানো"। এই বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের বহু গানে পুরাতন বর্জনীয়ের সমার্থক হয়ে দেখা দেয়। কবি পুরাতনকে বর্জন করে বা বিদায় জানিয়ে নূতনকে আবাহন করেন। বহুসময় "পুরাতন"এর সহচর "জীর্ণ"। তেমন দৃষ্টান্ত :

পুরানো জানিয়া চেও না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে
আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, **ফেলে দিই পুরাতনে**।। [৬]

একই অনুভূতি অভিব্যক্ত পরের গানদুটিতেও

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
...
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক,
আমারা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক। [৭]

জীর্ণ যা-কিছু যাহা-কিছু ক্ষীণ **নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন**---
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
নব-আলোকের স্নানে।। [৮]

আর দৃষ্টান্ত বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বহুসময়ে দেখা যায় নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে কবি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। যেমন আমরা দেখি বসন্তের এই গানে

পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজা। [৯]

এই সমস্ত গানে কবির কাছে নূতন পুরাতন সমান বরণীয়, সমান আদরণীয় হয়ে ওঠে। একজনকে বর্জন করে অপরের প্রতিষ্ঠা নয়, এই দুই বিপরীতের মিলনেই জীবনের মহিমার, তার বৈচিত্র্যের পূর্ণ প্রকাশ। অনেক গানেই আমরা দেখি নূতন ও পুরাতনের সহাবস্থান। তাই আকাশে প্রথম মেঘসমাগম দেখে কবি গেয়ে ওঠেন

এই **পুরাতন** হৃদয় আমার আজি পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।। [১০]

অথবা কখনও নূতন মেঘের মত নব তৃণদল পুরাতন হৃদয়ের উপর মায়াজাল রচনা করে।

কোন্ **পুরাতন** প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।।
চোখ ডুবে যায় **নবীন** ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব বাতাসে---

আর উদাহরণ না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় কিরে আসা যাক। আমাদের আলোচ্য গানটি দ্বিতীয় ধারার অনুসারী। প্রথমবার এই গানে যখন "পুরানো" বিশেষণটির প্রয়োগ ঘটল তখন ওই কলির অপরপ্রান্তে রয়েছে বিশেষণ "নব"। নবীন কিশলয় পুরানো আখরের আধার। চারিদিকে নববসন্তশোভার মাঝে পুরানো আখরগুলি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। শেষ কলিতে আর নূতন ও পুরাতনের সহাবস্থান নয়, পুরাতনই স্বমহিমায় একাকী বিরাজমান। আন্দোলিত মাধবীশাখা যেন তারই উড্ডীয়মান জয়ধ্বজা। এই জয় নবীনের পরাজয় নয়, এই জয় কালের বিরুদ্ধে ; এই পুরানো নূতনের বিপরীত নয়, এই পুরানো চিরনূতনের, চিরশাশ্বতের সমার্থক।

যেমন পত্রের কথাবস্তু, তেমনি কে সেই পত্রের লেখক তা কবির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু এই গানের অধিকাংশ কলিতে পত্রলেখকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়--- কবি তাকে বারবার সম্ভাষণ করেছেন। সর্বনামের প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে এই ক্ষেত্রে মধ্যমপুরুষের একাধিপত্য দেখা যায় ---- দশকলি বিশিষ্ট এই গানের সাতটি কলিতেই মধ্যমপুরুষের উপস্থিতি। তবে উল্লেখ্য শুধুমাত্র মধ্যমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে : তোমার, তব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই সর্বনামের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ্যটি "লিখন" অথবা তার অনুষঙ্গবাহী কোন শব্দ। অর্থাৎ এই গানে তাঁর পরিচয় কেবল পত্রের রচয়িতারূপে, তার আর অন্য কোন

ভূমিকা নেই। সমস্ত দৃশ্যপট জুড়ে সেই লিখন , তার লেখক অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে যান। কিন্তু সর্বত্রই তার অদৃশ্য উপস্থিতি। সেই লেখক যেন নিসর্গসৌন্দর্যলীন এক নিরবয়ব অরূপ সত্তা।

পত্রলেখকের এবং নিসর্গজগতের উপস্থাপনায় একটা সমান্তরালতা লক্ষ্য করা যায়। হারিয়ে যাওয়া আখরগুলি প্রথমে দেখা দিল "বনে বনে" --- নামবিহীন এক নিসর্গজগতে। তেমনই অজ্ঞাতনামা সেই লেখক। তারপর বনের স্থানে এল মল্লিকাবন --- নিসর্গজগৎ নামপরিচয় যুক্ত হল। আর ঠিক তখনই অনামা পত্রলেখকের নামের কথা এল ---- যে নাম পত্রের শেষে স্বাক্ষরিত । এই নাম আর কোন বর্ণের বা ধ্বনির সমষ্টি নয়, সেই নাম দৃষ্টিতে, শ্রুতিতে অধরাই থেকে যায়। সেই নাম মল্লিকার সৌরভে লীন থাকে। যা সাধারুণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য বা শ্রুতিগ্রাহ্য তার রূপান্তর ঘটে সৌরভে।

গানের অষ্টম কলিতে প্রথম শরীরী বাস্তবের চকিত আভাস --- পত্রলেখকের অঙ্গুলির স্পর্শ। কিন্তু অঙ্গুলি এখানে প্রধান নয়, সত্য এখানে সেই কোমল অঙ্গুলির স্পর্শবাহী বাণী। এই গানের ধ্বনিগত গঠনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। এই গানে আস্থায়ী, অন্তরা, ও আভোগের অন্ত্যমিল 'লি' ধ্বনিতে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে এই গানে 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায়। তরল ধ্বনির এই পৌনঃপৌনিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যেন সেই অদৃশ্য অঙ্গুলির পরশের কোমলতা সমস্ত গানে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যমপুরুষের পর এবার এই গানে উত্তমপুরুষের প্রয়োগের পর্যালোচনা করা যেতে পারে --- দেখা যাক কবির ভূমিকা কি। সর্বনামের উত্তমপুরুষের রূপটি এই গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই "আমি"র উপস্থিতি একমাত্র অন্তরার শুরুতে ক্রিয়ারূপে --- বসে আছি। আপাতদৃষ্টিতে কবির ভূমিকা এখানে নিষ্ক্রিয় --- একা বসে থাকা ছাড়া তাঁর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু গভীরতর পাঠে দেখা যায় কবির ভূমিকাই এখানে প্রধান। একমাত্র আস্থায়ী অংশেই কবির ভূমিকা দ্রষ্টা ও ভাষ্যকারের --- যখন কবি ওই ছেঁড়া চিঠির টুকরো বা লিখনকে প্রত্যক্ষ করেন কেবল ইন্দ্রিয়চেতনায়। তারপর অন্তরার শুরু থেকে কবি অবতীর্ণ হন স্রষ্টার ভূমিকায়। এই একা বসে থাকা কবির ধ্যানমগ্নতার সঙ্কেতবাহী --- যে তন্ময়তা থেকে নান্দনিক সৃষ্টিধারার উৎসার। গানের পটভূমি --- চৈত্ররজনী, নবশ্যামল কিশলয়ে আকীর্ণ কাননভূমি, সুরভিত মল্লিকাবন, আন্দোলিত মাধবীকুঞ্জ --- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব নিসর্গজগতের বাণীরূপায়ণ নয়। এই নৈসর্গিক পটভূমি সম্পূর্ণ কবিমনের নির্মাণ --- গান সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তা নিশ্চিত। হারিয়ে যাওয়া বাণী উৎকীর্ণ করতে কবি এই নূতন পটভূমি রচনা করেছেন। কবির ভূমিকা শকুন্তলার কাহিনির ধীবরের মত --- শকুন্তলার হারানো অভিজ্ঞানের মত কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া সেই রমণীয় মুহূর্তগুলি কবিই উদ্ধার করে আনেন।

আর একবার উত্তমপুরুষের অদৃশ্য উপস্থিতি আভোগে --- গানের নবম কলিতে। এই মন অবশ্যই "আমার" মন --- কবিমন। এখানে "মন"এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্বন্ধপদ "আমার" উহ্য। তবে এখানে "আমার"এর এই অনুপস্থিতির এক ভিন্নতর ব্যাখ্যা সম্ভব। সেই হারানো বাণী পাঠে সঞ্চারিত অতলান্ত বিরহের অনুভূতি কেবল কবিমনকে উদ্বেল করে তোলে না, সেই অনুভূতি বিশ্বমানবমনকে স্পর্শ করে।

যে সমস্ত গানরচনার পটভূমিতে অন্তর্নিহিত কাহিনি জানা যায়, তার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি আর কেবল ঘটনার সাক্ষী থাকেন না, তিনি আপন ভাবনায় পুনর্নির্মিত সেই কাহিনির একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন। এই গানেও কবির সেই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এই গানের পত্রলেখকের মত পত্রপ্রাপকের পরিচয়ও অজ্ঞাত। গানের অদৃশ্য পত্রলেখক কবির সৃষ্টি। আর সেই অজানা পত্রপ্রেরকের সঙ্গে কবি স্বয়ং নিজেকে একাত্ম করে নেন। তাঁর সেই চৈত্ররজনীতে একা বসে থাকা যেন সেই পত্রের জন্য প্রতীক্ষার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিসর্গশোভায় মুদ্রিত সেই কল্পলিপির পাঠক শুধু তিনি। এই পাঠ স্রষ্টার আপন সৃষ্টির রসাস্বাদন।

কে ছিল এই পত্রের লেখক, কি ছিল তার বিষয়বস্তু কেউ কোনদিন জানবে না। হয়তো সেই চিঠিতে তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তা ছিল, হয়তো বা পাওয়ামাত্রই তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল । কিন্তু কবির ভাবনায় সেই তুচ্ছ বস্তুটি একদা পরম আদরণীয় কোন বস্তুরূপেই প্রতীয়মান হয়েছিল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম প্রতিটি তৃণ, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত প্রসারিত। যা কিছু উপেক্ষিত, অবহেলিত তার প্রতি কবির ভালোবাসা গভীরতম। তাইতো সামান্য একটি ছেঁড়া চিঠির টুকরোর প্রতি অনাদরও তাঁর কুসুমকোমল হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছিল --- যার থেকে এই গানের সৃষ্টি। কোন একদিন তারই লেখা চিঠি এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণা হতে পেরেছিল --- চিরতরে হারিয়ে যাওয়া নামপরিচয়হীন সেই পত্রলেখকের সেটাই চরম প্রাপ্তি।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৩৮২

২) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫, পৃ ২২২

৩) পাল , প্রশান্তকুমা:রবীন্দ্রজীবনী, নবম খণ্ড, কলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩, পৃ ২৯৫

৪) তদেব , পৃ ২৯৬

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৩৮

৬) তদেব, পৃ ৩০২

৭) তদেব, পৃ ৫৬৭

৮) তদেব, পৃ ১১৭

৯) তদেব, পৃ ৫২৮

১০) তদেব, পৃ ৪৬৪

১১) তদেব, পৃ ৪৪৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩

দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১

রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০

সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,*গানের ঝরনাতলায়,* কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩

সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২